ভাওয়াল মামলার রায়

দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বের ফটো

সম্পাদক—
সদাগর মিঞা
ও
শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
১৭৬নং সিদ্ধির বাজার লেন (ষ্টেশন রোড), ঢাকা।

মূল্য /০ এক আনা মাত্র

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার উপসংহার

খরচা সহ বাদীর অনুকূলে রায়

বাদী সন্ন্যাসীই ভাওয়ালের

দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ

বলিয়া সাব্যস্ত

—*—

মামলার বিচারক

ঢাকার অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজ শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু এই মামলায় বিচার করিয়াছেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখে তাঁহার জন্ম হয় এম-এ ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৯১০ সালের ২১শে মার্চ্চ তারিখে তিনি মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালের প্রথম হইতে ১৯২৬ সালের শেষ পর্য্যন্ত তিনি ঢাকায় মুন্সেফের পদে বহাল ছিলেন। ১৯৩২ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি সাবজজের পদে উন্নত হন।

১৯৩৩ সালের ১১ই মার্চ্চ তারিখে তিনি পুনরায় ঢাকায় বদলী হইয়া আসেন। ঐ বৎসর ২৭শে নভেম্বর হইতে তাঁহার এজলাসে ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। গত বৎসর তিনি অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজের পদে উন্নীত হন।

শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার বাড়ী কলিকাতা আমহার্ষ্ট রো'তে। তিনি রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ"

ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুবাদ খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বে সহস্র সহস্র লোক আদালত প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হয়। নিকটবর্ত্তী রাস্তা ও স্থানসমূহ লোকে লোকারণ্য লইয়া যায় রাস্তা দিয়া লোকজনের চলাচল একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। ২৪শে আগষ্ট বেলা ১১টার সময় দেখা গেল, আদালত প্রাঙ্গণ যেন নরসমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। অতিকষ্টে জনতা ভেদ করিয়া আদালতে প্রবেশ করিতে হইল। জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য মোড়ে মোড়ে পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে। যথাসময়ে বিজ্ঞ জজ শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু আসিয়া উপস্থিত হন।

আদালতে উপবেশন করিয়া অতিরিক্ত জেলা জজ শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু মহাশয় ঠিক ১১ টার সময় রায় প্রকাশ করেন। সুদীর্ঘ রায়ের সমস্ত না পড়িয়াই তিনি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, বাদীই ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ।

রায় বাহির হইবার পরই সমবেত জনতা, বাদীর বাসস্থান অভিমুখে ধাবিত হয়। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীও এই বাড়ীতেই আছেন। আগ্রাহাকুল জনতা উৎসাহের আতিশয্যে কুমারের বাড়ীর সম্মুখ স্থিত সমগ্র পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় তাহারা ঘন ঘন আনন্দধ্বনি করিতে থাকে।

জনসাধারণের অনুরোধে বাদী কুমার বাহাদুর বাড়ীর বাহিরে আসিয়া সকলকে দর্শন দান করেন। সর্ব্বসাধারণের সাহায্য সহানুভূতি লাভের জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ দেন এবং বলেন—'আপনারা সকলে শান্ত থাকুন, ভগবানকে ধন্যবাদ দেন, তাঁহারই অনুগ্রহে আমাদের জয় হইয়াছে।'

কথাগুলি বলিবার সময় তিনি নিজেই ভাবাবেগে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঢাকা সহরের সর্ব্বত্র আনন্দ উল্লাস পরিলক্ষিত

হইতেছে। হিন্দু মুসলমান সকলে মিলিয়া এই মামলার রায় শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।

রায় শুনিবার জন্য সহস্রাধিক লোক আদালত প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিল। জজের সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইয়া তাহারা "ভাওয়াল কুমারকী জয়, "মেজ কুমারকী জয়"—ইত্যাদি ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত করে। দেখিতে দেখিতে এই সংবাদ ঢাকা নগরীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে তখন আর্ম্মানিটোলায় কুমার বাহাদুরের বাসস্থানে বহু লোক সমবেত হয়। তাহারা নানাভাবে আনন্দপ্রকাশ করিতে থাকে।

আদালতের মধ্যে কেবল উকীল ও সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জজের সিদ্ধান্ত শুনিবার প্রতীক্ষায় ছিলেন। জজ সাহেব বলেন যে, তাঁহার রায় সুদীর্ঘ ৫৫২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ কাগজে টাইপ করা হইয়াছে। অতএব তিনি সমগ্র রায় না পড়িয়া কেবল তাঁহার সিদ্ধান্তের কথাই আদালতে পাঠ করিবেন।

বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানের বার লাইব্রেরীর সদস্যগণ, ঢাকা বার লাইব্রেরীর নিকট টাকা পাঠাইয়া অনুরোধ করিয়াছেন যে, ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার রায়ের সারমর্ম্ম যেন তারযোগে তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করেন।

বিচারকের মন্তব্য

বিচারক রায়ে মন্তব্য করেন, "আমি এই মামলার সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ এবং উভয় পক্ষের সুযোগ্য কৌসুলীগণের সওয়াল বিশেষ সাবধানতা সহকারে বিবেচনা করিয়াছি। বিষয়টীর গুরুত্ব এবং এই সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের জটিলতা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। পরিচয় নির্ণয়ের পক্ষে অনেক প্রমাণ থাকিতে পারে; কিন্তু একটি মাত্র বিষয় দ্বারা সমস্ত প্রমাণ ব্যর্থ হইতে পারে। সুতরাং

যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। বাদীর পরিচয় সম্পর্কে যে সকল প্রত্যক্ষ সাক্ষী আছে আমি তাহা বিশ্বাস করি, কারণ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সাধু নরনারী সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং সাক্ষীদের মধ্যে কুমারের ভাগিনী, বড়রাণী, এবং মেজরাণীর নিজের মামীও মামাতো বোনও আছেন। বহু উচ্চ শিক্ষিত, পদস্থ, বয়স্ক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছেন। অন্য যে কোনও লোকের ন্যায় তাঁহারাও উপহাসকে ভয় করেন, তাঁহাদের এই ব্যাপারে কোনই স্বার্থ নাই এবং তাঁহারা কুমারকে কিছুতেই ভ্রম করিতে পারেন না। তাঁহারা যে একজন প্রতারককে সমর্থন করিবার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন, তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু এই সকল সাক্ষীর সাক্ষ্যও শুধু বিশ্বাস প্রবণতা বলে বিশ্বাস করিবার হেতু নাই; এই সকল সাক্ষ্য সমস্ত কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

তন্মধ্যে ১৯২১ সালের ৪টা মে যেদিন বাদী ঘোষণা করিলেন যে, তিনি ভাওয়ালের মেজকুমার—সেইদিনকার অতর্কিত পরিস্থিতি ইহার অন্যতম পরীক্ষা। সেদিন যাহা ঘটিয়াছিল তাহাতে বাদীর পূর্ব্ব পরিচিত লোকেরা তাঁহাকে সত্য সত্যই চিনিতে না পারিলে ঐরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারিত না। এমন কি বিবাদীপক্ষের প্রধান তদ্বিরকারক রায় সাহেব যোগেন বানার্জ্জি যিনি মেজকুমারের চরিত্রে আরোপিত মিথ্যা বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁহার সাধ্যানুযায়ী সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ১৯২১ সালের ৪ঠা মে ভগ্নী ও ভাগিনেয়গণ, সাধু যে মেজকুমার তাহা সরলভাবে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, নিনি নিজে তাহা বিশ্বাস না করিলে কখনও তাহাদের কথা বিশ্বাস করিতে পারেন না। কারণ তিনি সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিলেন এবং কুমারকেও চিনিতেন। নীডহামের রিপোর্ট যাহা প্রকৃতপক্ষে যোগেন বানার্জ্জিরই রিপোর্ট তাহা একজন বিশ্বাসকারীর রিপোর্ট এবং সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করিলে উহা যে

একটী অকস্মাৎ সৃষ্ট ষড়যন্ত্র—যে ষড়যন্ত্রে একজন সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারার পাঞ্জাবীকে কুমার বলিয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টা হইয়াছে ঐরূপ মতবাদের কোন স্থান হয় না। বিবাদীপক্ষের উহাই একমাত্র মতবাদ যাহার উপর তাঁহারা নির্ভর করিয়াছেন এবং যে মতবাদের কোন অর্থই হয় না—যদি না মেজকুমারের ভগ্নী এবং তৎসঙ্গে পরগণার সমস্ত লোক পাগল হইয়া গিয়া থাকে। যদি মেজকুমারের ভগ্নীর কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট সকলের কথাই বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে।

আর একটী সতঃসিদ্ধ প্রমাণ বাদির শারিরিক বৈশিষ্ট্য ও শারীরিক চিহ্ন। বাদীর শরীর পরিক্ষা করিয়া ঐসব বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন সুস্পষ্ট-ভাবে ও অঙ্কের মত নির্ভুল ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ সব প্রমাণ অপরের বিশ্বাস অবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। ঐ সবগুলি সমগ্র-দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে ঘটিতে পারে না। এবং যদি চিহ্নসমূহের অর্দ্ধেকাংশ বাদও দেওয়া যায় তাহা হইলেও খসখসে পা, বা পায়ের গোড়ালির অসমান ক্ষতচিহ্ন তৎসঙ্গে শারিরিক বৈশিষ্ট্য বাদিকে নিশ্চিত রূপে সনাক্ত করা সম্পর্কে যথেষ্ট বলিয়া মনে হইবে। প্রত্যেক বিশেষ কতকগুলি আকস্মিক দুর্ঘটনার সমাবেশ, যেসব ঘটনার কখনও পুনরাবৃত্তি হয় না এবং যাহার ফলে তাহার একটী বৈশিষ্ট্য জন্মে। বাদী সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত তাঁহার মন হইতে কিছুতেই দূর হইতেছে না। বিবাদীপক্ষ ঐ সব ঘটনার অনেকগুলিই উদ্‌ঘাটন করিতে সাহসী না হওয়ায় ঐ সিদ্ধান্তই সমর্থন করে। তাঁহার হস্তাক্ষরও উহা সমর্থন করে, দার্জ্জিলিংএ যাহা ঘটিয়াছে অথবা কুমার যতদিন নিখোজ ছিলেন তৎসম্পর্কে যে বিবরণই কেন দেওয়া হউক না কিছুতেই সিদ্ধান্ত খণ্ডন হয় না। তিনি যদি পঙ্গু ও বধির হইয়াও প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন তাহা হইলেও ঐ সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্ত্তন হইত না। বাধ বাধ কথা ও হিন্দী টানে কিছু যায় আসে না।

১৯২১ সালের ৪ঠা মের পূর্ব্বে এমন কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া দেখা যায় না যাহাতে ষড়যন্ত্রের কোন কথা আসিতে পারে। তাহার পরের আচরণ দ্বারাও ঐরূপ ষড়যন্ত্র হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় না। তাঁহার আগমণের প্রথম হইতে মামলা দায়ের হওয়া পর্য্যন্ত তিনি লুক্কায়িত ছিলেন না। তাঁহার নিকট সকলেই যাইতে পারিত। অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছে এবং ১৯২১ সালের ১৫ মে অসংখ্য প্রজা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করে। বাদী যেদিন তাঁহার পরিচয় দেন তাহার ২৪ দিন পরে, ২৯শে মে তিনি ঢাকায় কালেক্টরের নিকট হাজির হইয়া একাই তাঁহার সঙ্গে আলাপ করেন এবং তদন্তের জন্য প্রার্থনা করেন।

১৯২১ সালের মে মাস হইতে তাঁহার ভগিনী ও তাঁহার পিতামহি কালেক্টারের নিকট তদন্তের জন্য দরখাস্ত করিতেছিলেন এবং তিনি সেই তদন্তের সম্মুখিন হইতে ও প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি খাজানা আদায় করিয়া, চাঁদা আদায় করিয়া অসংখ্য অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছিলেন এবং ১৯২৯ ও ১৯৩০ সালে তিনি এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে এষ্টেটের খাজানা আদায় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাকে কেহ প্রতিরোধ করে নাই, কেহ কোন প্রশ্ন করে নাই, কিম্বা অভিযুক্ত করে নাই। কেহ এইরূপ চাহিয়াছিলেন যে তাঁহাকে প্রতিরোধ করা না হয় কিংবা প্রশ্ন করা না হয় তাঁহার আরও ইচ্ছা ছিল যে, তিনি যে কে সে সম্বন্ধেও যেন ঢাকার বাদীকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা না হয়। সেই ব্যক্তিটি যে কে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তিনি রায় সত্যেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি বাহাদুর, যিনি তাঁহার সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন এবং যাঁহার নিকট কুমারের আগমন বাস্তবিকই বিপৎপাত বিশেষ। ৬ই মে তারিখ অর্থাৎ যেদিন বাদি, তিনি কে উহা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং যখন বাদি কিরূপ সমর্থন পাইবেন তাহা জানা ছিল না, সেদিনও তিনি (সত্যেনবাবু) জানিতেন

যে, তাঁহার একমাত্র উপায় হইল মৃত্যুর উপর জোর দেওয়া। তিনি অতিদ্রুত মিঃ লেথব্রিজের নিকট যান এবং বলেন যে, মৃত্যুর প্রমাণগুলি রক্ষা করিতে হইবে। তিনি মৃত্যু সম্পর্কে যে সমস্ত এফিডেভিট রাখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হাতে দেন। তিনি মিঃ লিণ্ডসের নিকট মৃত্যু সম্পর্কিত এফিডেভিট ও দাহ সম্পর্কিত প্রমাণ প্রেরণ করেন এইরূপে মিঃ লেণ্ডসে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিত ধারণা করেন এবং তিনি বাদীকে প্রতারক বলিয়া ঘোষণা করেন। এইরূপ ঘোষণার পর প্রায় কোন প্রতারকই টিকিতে পারিত না—ইহাতে এই ধারণার সৃষ্টি করে এবং সাক্ষীদের মধ্যেও অনেকের এই ধারণা ছিল যে, ঐ ব্যাপারটি এখন প্রথম বিবাদী মেজরাণী ও বাদীর মধ্যে নহে, উহা বাদী ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

এই ঘোষণায় বাদির অসুবিধা হইল বটে, কিন্তু তিনি বাবু হইয়া পড়িলেন না। তিনি জানাশুনা লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন, সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সহিত দেখা করিতে লাগিলেন এবং সরকারি কর্ম্মচারিদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদন্তের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ১৯২১ সালের ২৯শে মে মিঃ লেণ্ডসে তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন; ১৯২৩ সালে মিঃ কে সি দে আবার তাঁহাকে মিথ্যা আশ্বাস দিলেন। ১৯২৭ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কদাপি তাঁহার প্রার্থনা প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করা হয় নাই। মিঃ চৌধুরি এই সকল বিষয় কতকটা উপেক্ষা করিয়া শুধু এই মামলা রুজু করিতে বিলম্বের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বাদিকে যাহাতে মেজকুমার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়, তজ্জন্য তাঁহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া লইতে সময় লাগিয়াছিল বলিয়াই বিলম্বে এই মামলা রুজু করা হইয়াছে। বাদি আত্মপরিচয় দিবার ২ দিন পর তিনি নিজেই মিঃ লিণ্ডসকে তদন্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভগিনি উহার পূর্ব্বেই তদন্তের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন।

তিনি সকল সময়ের ন্যায় তখনও যে কোনও ব্যক্তির সম্মুখীন হইতেও জবাবাদি করিতে প্রস্তুত ছিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি কখনও তাঁহাকে বলা হয় নাই যে, তদন্ত করা হইবে না। ১৯২৭ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাকে বলা হয় নাই যে, আদালতের দরজা খোলা রহিয়াছে, তিনি আদালতে যাইতে পারেন। মামলা মোকদ্দমা ব্যতিত তাঁহারা অংশ পাইবার চেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া ১৯৩০ সালে তিনি মামলা রুজু করেন। এষ্টেটের বিরুদ্ধে মামলা করা সহজ কথা নয়; বাদিকে কতদূর শিখান পড়ান হইয়াছে, তাহা জেরা হইতেই বুঝা যায়। তিনি পূর্ব্বাপর একরূপই আছেন—এখনও তাঁহার বর্ণজ্ঞান জন্মে নাই। তাঁহার আচরণ আগাগোড়াই সন্দেহের অতিত, কিন্তু সত্য বানার্জ্জীর আচরণ কি? তিনি এই হতভাগ্য ব্যক্তির সম্পত্তির উপভোগ করিতেছেন বাদিই যে মেজকুমার তাহা জানা সত্বে ও দৃঢ়তার সহিত বলা হইয়াছে,—তিনি মেজকুমার নহেন এবং তাঁহার অর্থবলেই তাঁহার দাবীর বিরোধিতা করা হইয়াছে। লোকের আচরণ দিয়াই লোক বুঝা যায় এবং আচরণ দ্বারা লোকের গলদও প্রকাশ পায়। ১৯২১ সালের ৬ই মে তারিখে, অর্থাৎ বাদি নিজকে মেজকুমার বলিয়া ঘোষণা করিবার দুই দিন পরই সন্ন্যাসীর ভয় সত্যব'বুকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং ঐ ভয় বশতঃই তিনি মিঃ লেথব্রিজের নিকট গিয়া মৃত্যুর প্রমাণ রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

বিবাদী পক্ষের ভয় সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া বিচারক তাঁহার রায়ে বলেন যে, ইন্সিওরেন্স ডাক্তারের রিপোর্টে কুমারের শরীরের কতকগুলি চিহ্নের কথা উল্লেখ ছিল, বিবাদী পক্ষের ভয় ছিল সেই রিপোর্টের। বিবাদী পক্ষ ১৯২১ সালে সেই রিপোর্ট দেখিয়া ছিলেন; বাদী যদি জালই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাহা ধরাইয়া দিবার জন্য সেই রিপোর্ট আনাইতে পারিতেন কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই তাঁহারা মনে

করিয়াছিলেন যে, স্কটল্যাণ্ড ইনসিওরেন্স কোম্পানীর আফিসে সেই রিপোর্ট কেহ দেখিতে পাইবে না। কিন্তু তথাকথিত জাল কুমারই সেই রিপোর্ট সংগ্রহ করিলেন। অন্যান্য দলিলের মতই আগ্রহ সহকারে সেই দলিল সংগ্রহ করিলেন। এই দলিলে কুমারের দেহের বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

হস্তাক্ষর বিশারদের কথা

হস্তাক্ষর বিশারদের সাক্ষ্য আহ্বানের দরখাস্তেও এই ভয়ের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কোর্ট অব ওয়ার্ডস যখন তদন্ত করেন সে সময় দর্জ্জিদের নিকট হইতে ও জুতাপ্রস্তুতকারকদের নিকট হইতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করা হইয়াছিল সত্যবাবু বলিয়াছেন যে, সেই সমস্ত বিষয় বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলীর হস্তে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ এই সমস্ত বিষয়ের কোনও বিস্তারিত বিবরণই আদালতে দাখিল করা হয় নাই। সেই সমস্ত বিষয়ের কোনও প্রমাণও উপস্থিত করা হয় নাই। শুধু বলা হইয়াছে যে, কুমারের পায়ে ৬ নম্বরের জুতা লাগিত। কৌঁসুলীকে এই জুতার কথা উল্লেখ করিতে পরামর্শ দেওয়া হয় নাই। তিনি ভুল বুঝিয়া উহা করিয়াছিলেন। বাদীর পা দেখিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, পা অনেক বড়, ঐ নম্বরের জুতা পায়ে লাগিবে না। বাদীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হইবার পর বাদীর স্মৃতি সম্বন্ধে কোনও জেরা করা হয় নাই অজুহাত দেখান হইয়াছে যে, তাঁহাকে পূর্ব্ব কথা সব শিখাইয়া পড়াইয়া রাখা হইয়াছে। এই অজুহাত একান্ত বাজে। কোনও সাক্ষীকে শিখাইয়া পড়াইয়া রাখা হইয়াছে এই অজুহাতে জেরা না করার মত অদ্ভুত যুক্তি এ পর্য্যন্ত শোনা যায় নাই। আসল কথা হইল এই যে, বিবাদিপক্ষের মনে ভয় ছিল যে, জেরা করিতে গেলে বেফাঁস কথাতো বাহির হইবেই না বরং আরও অনেক সত্য কথা বাহির হইয়া পড়িবে।

সত্যকে রোধ করা যায় নাই

কোনও জটিল মামলার কেহই সত্যকে অধিক দিন রোধ করিতে পারে না। সত্য কথা কোন না কোনও প্রকারে প্রকাশ পাইয়া অনুমানকে ভাঙ্গিয়া নিবে। যদি এরূপ ক্ষেত্রে কেহ সত্যকে রোধ করিতে যায় তবে বুঝিতে হইবে তাহার মাথার দোষ আছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিবাদিপক্ষের কাহারাও মাথা খারাপ হইয়াছিল, তিনি সম্ভবঃ অসম্ভবের মাত্রা জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

বাদীর সরল পথ

পক্ষান্তরে বাদীর আচরণ অতি সহজ সরল। কেহ তাঁহাকে খুঁজিয়া আনেন নাই। তিনি আসিয়াছিলেন ফকির বেশে। আকস্মাৎ একদিন তিনি বলিলেন—তিনিই কুমার। এই কথা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। তাঁহার ভগ্নীরা তাঁহাকে দেখিলেন। একজনে দেখা মাত্রই তাঁহাকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন, আর একজন লইলেন না। যিনি তাঁহাকে ভাই বলিয়া চিনিলেন, তিনি তাঁহাকে লোকচক্ষুর অগোচরে রাখিলেন না, তাঁহার দাবী পেশ করিবার জন্য তাঁহাকে কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইলেন।

বিবাদিপক্ষের নানারূপ কথা

বিবাদীপক্ষ একটার পর একটা করিয়া কত রকম কথাই তুলিয়াছেন, কিন্তু সত্যের সম্মুখে আসিয়া একটাও টিকে নাই। দর্জ্জিলিংএ কুমারের অসুখ এবং মৃত্যুর কথা অতি সাবধানে সাজান হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে যে মিথ্যার ছাপ ছিল তাহাতেই ঐ সাজান কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় শুধু তাহাই নহে, মৃত্যুর সময়, রক্ত বাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের পরিদর্শন, কাশীশ্বরী দেবীর অনুপস্থিতি ইত্যাদি কঠোর সত্যের দ্বারাও এটা সাজান কথার অসত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।

কুমার ভাল লেখাপড়া জানিতেন, সাহেবী ধরণে থাকিতেন, ইংরেজী কথা বলিতে পারিতেন, বিবাদী পক্ষ হইতে এরূপ বলা হইয়াছে এ সম্বন্ধে কথা না বলিলে মিথ্যার সঙ্গে খাপ খায় না। কুমার যে লেখাপড়া জানিতেন তাহা প্রমাণ করার জন্য চিঠি জাল করা হইয়াছে। এরূপ জাল প্রমাণ হইলে মৃত্যুর সামিল হইত।

ফলে এই হইল যে, প্রতিবাদী পক্ষে প্রয়োজন মত সাক্ষি দিতে প্রস্তুত একদল কর্ম্মচারী থাকিলেও সাক্ষ্য প্রমাণ তাহাদের অনুকূলে ছিল না। তাই তাহারা নিজের প্রয়োজন মত মামলা গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। বাস্তবের সহিত তাহার এত পার্থক্য এমন একটি লোককে কুমার বলিয়া ধরিয়া লওয়া অসম্ভব, এই যুক্তিতে প্রতিবাদীপক্ষ বলিল যে, অন্য লোক মিথ্যা পরিচয় দিয়া বেড়াইতেছে। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দ্দেশ মত পুস্তক পাঠ করিয়া বাদী কতকগুলি শব্দ আরম্ভ করার চেষ্টা করিয়াছে, এমন কথাও প্রতিবাদী পক্ষ বলিয়াছে। তাহারা এই সম্পর্কে ডাঃ আশুতোষ দাশগুপ্তের নজীরও দাঁড় করিয়াছিল। প্রতিবাদী পক্ষ যে সমস্ত বাজে করিয়াছে ইহা তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত মাত্র।

মেজরাণীর অসহায় অবস্থা

অতঃপর বিচারক মন্তব্য করেন যে, এই বার বৎসরকাল বাদি ঢাকা ও কলিকাতা এবং অধিকাংশ সময় ঢাকায় বাস করিয়াছে। অথচ প্রচুর সঙ্গতি থাকা সত্বেও ভাওয়াল এষ্ট্রেট হইতে যে কে তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। মিঃ লিণ্ডসে এই ঘটনা সম্পর্কে পাঞ্জাবে তদন্তের জন্য নির্দ্দেশ দেন, কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, তদন্তের ফলাফল প্রতিবাদিপক্ষের অনুকূলে গড়িয়া তুলিবার মত লোক তথায়ও ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট লেফটেন্যান্ট রঘুবীর সিংহের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি বাজে ছবি দেখাইয়া তথায় সমস্ত জবানবন্দি

সংগ্রহ করা হইয়াছিল। তাই অসাধুতার জন্য বরখাস্ত একজন কেরাণী ও মেজরাণীর একজন জ্ঞাতি ভ্রাতা ছাড়া উত্তর পাড়াস্থ তাঁহার (মেজরাণী) পদস্থ আত্মীয়বর্গের কেহই প্রতিবাদী পক্ষে যে সাক্ষ্য দেয় নাই তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। অনেকে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা কুমারকে এক সময় চিনিতেন, কিন্তু এখন ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে এমন কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি পাওয়া যায় নাই, যিনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, বাদি কুমার নহে।

"মেজরাণীর অবস্থা আমি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি। ভ্রাতার নিকট তাঁহার নিজের কোনও মতামত খাটে না। তাঁহার আয়—তাঁহার সমস্ত আয়ই তাঁহার ভ্রাতা পাইতেছেন। ব্যাঙ্কে তাঁহার একটী হিসাবও নাই—যদিও আর প্রায় লক্ষ টাকা। তিনি নিজে কোনও টাকা রাখেন বা তাঁহাকে রাখিতে দেওয়া হয়—ইহা প্রমাণ করা যায়, এমন কোনও কাগজপত্র নাই এই নিঃসন্তান মহিলাটীর জয়দেবপুরে অবস্থান কালের এমন কোনও ঘটনা নাই যাহা তিনি আনন্দের সহিত স্মরণ করিতে পারেন। যেরূপ জিবন ধারায় তিনি অভ্যস্ত হইয়াছিলেন এবং এযাবৎকাল পর্য্যন্ত তিনি স্বত্বাধিকারিণী হিসাবে যে গৌরব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে কুৎসিৎ ব্যাধিগ্রস্ত লম্পট স্বামির প্রতি তাঁহার মনে একটা বিরুদ্ধভাব জন্মিবারই কথা। সর্ব্বোপরি, যখন বিষপ্রয়োগের অভিযোগ করা হইল—১৯২১ সালে তাঁহার ভ্রাতাকে ঐ অভিযোগের কথা টেলিগ্রাম করিয়া জানান হইল তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি সত্য বানার্জ্জির ভগিনিস্বরূপই পরিচিতা হইবেন, মেজকুমারের পত্নিস্বরূপ পরিচিতা হইবেন না মেজরাণীর ভ্রাতার নিকট কুমারের প্রত্যাগমনের অর্থ—চমৎকার একক সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়া—একটী বিপদপাত এই বিপদ নিবারণে সত্য বানার্জ্জী যে আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন তাহা স্বাভাবিক

"আমি সাব্যস্ত করিতেছি, বাদী ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র রমেন্দ্রনারায়ণ রায় আমি আরও সাব্যস্ত করিতেছি যে, বাদীকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দেওয়া হইয়াছিল এবং অনুষ্ঠান পালন করিলে সাংসারিক হিসাবে লোকে মৃত বলিয়া গণ্য হয়, সেই অনুষ্ঠান তিনি পালন করিয়াছেন এমন কোনও প্রমাণ নাই।"

অতঃপর জজ বলেন, বাদী যে সম্পত্তি দাবী করিয়াছেন ১৯০৯ সালের ৮ই মে পর্য্যন্ত উহা তাঁহার অধিকারে ছিল অতঃপর তিনি নিরুদ্দিষ্ট এবং মৃত বলিয়া বিবেচিত হন। তাঁহার পত্নী হিন্দু বিধবা হিসাবে এই সম্পত্তির অধিকারিণী হন; হিন্দু আইন অনুসারে উহা বিধবার সম্পত্তি বলিয়াই তিনি গ্রহণ করেন। বিবাদী পক্ষের যুক্তি এই যে, তিনি ১৯০৯ সাল হইতে বার বৎসরের অধিক কাল এই সম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন, সুতরাং ইহা তমাদি দোষে বারিত। কুমারের ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত তিনি এই সম্পত্তি হিন্দু বিধবার মত ভোগ করিতেছিলেন। ১৯২১ সালের ৪ঠা মে তারিখে বাদী যখন কুমার বলিয়া আত্মপরিচয় দেন তখন হইতে মেজরাণীর অধিকার বাতিল ধরিয়া লইলে দেখা যায় যে, ঐ তারিখের বার বৎসরের মধ্যে এই মামলা রুজু করা হইয়াছিল। বিধবার যতটুকু প্রাপ্য তাহার অধিক তিনি কখনই দাবী করেন নাই। সুতরং মামলা তমাদি দোষে বারিত নহে। স্বত্ব প্রতিপন্ন করার কিম্বা স্বত্ব বেজায় না থাকিলে উহা পুনরুদ্ধারের দাবী বাদী করিয়াছেন। ১৯৩০ সালে কিম্বা মামলা দায়ের হওয়ার পরের অন্যান্য বৎসরের পুণ্যাহে তিনি খাজনা আদায় করেন নাই। তাহাকে বাধা দেওয়া হইয়াছে। বাদী ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র রমেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের যাহা বর্ত্তমানে মেজরাণীর দখলে আছে, অধিকারী;— এই মর্ম্মে একটী ডিক্রি জারী হইবে।

এই ডিক্রী বিবাদিগণের বিরুদ্ধে, শুধু মাত্র বড়রাণীর বিরুদ্ধে, একতরফা জারী হইবে। যে সমস্ত প্রতিবাদী মামলা চালাইয়াছে তাহাদিগকে বার্ষিক শতকরা ছয় টাকা হিসাবে মামলার খরচা দিতে হইবে।

জোতির্ম্ময়ী দেবী ও আশু ডাক্তারের মূর্চ্ছা

কুমারের ভগ্নি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যখন শুনিলেন যে, বাদী মেজকুমার বলিয়া আদালত কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়াছেন, তিনি তখনই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। ক্ষণকাল পরে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকেন।

মেজকুমার রায় শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠেন তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য ভাওয়ালের হাজার হাজার প্রজা আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। কুমার মৃদু হাস্য সহকারে সকলের অভিনন্দনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বাঙ্গলার নানাস্থান হইতে অবিরত সম্বর্দ্ধনা-সূচক বার্ত্তা আসিতেছে বহু উকিল সভা হইতেও মেজকুমারকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া তারবার্ত্তা আসিতেছে।

জয়দেবপুরে শোভাযাত্রা

মেজকুমারের পক্ষে মামলার ডিক্রি হইয়াছে জয়দেবপুরে এই খবর আসিয়া পৌছান মাত্র কুমারের জয়ে আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য নানাস্থান হইতে শোভাযাত্রা বাহির হইতে থাকে।

আশু ডাক্তার মূর্চ্ছিত

ডাঃ আশু দাশগুপ্তকে রায়ের খবর জানান মাত্র তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ঢাকা টেলিগ্রাফ অফিস হইতে এই মামলার রায় সম্পর্কে হাজার হাজার শব্দ বাহিরে প্রেরিত হইয়াছে। ঢাকা টেলিগ্রাফ অফিস এবিষয়ে যথেষ্ট তৎপরতা ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

মামলার বিচার্য্য বিষয়

ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার বিচার্য্য বিষয়সমূহের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) বাদির মামলা দায়ের করিবার কোন কারণ ঘটিয়াছে কি না।

(২) এই মামলা তমাদি দোষে বারিত কি না।

(৩) দখলে নাই বলিয়া বাদী সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত কি না।

(৪) বাদী ভাওয়ালের মেজকুমার কিনা।

(৫) বাদী ও ভাওয়ালের মেজকুমারের মধ্যে সাদৃশ্য আছে কিনা।

(৬) প্রতিবাদী পক্ষের লিখিত জবানবন্দি অনুসারে সন্ন্যাসগ্রহণের ফলে বাদি ঐহিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে কি না;

প্রতিবাদি পক্ষের অথবা, লিখিত বিবৃতি অনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণের কথা মানিয়া লইয়াও বাদিকে ঐহিক অধিকার সম্পর্কিত কোন সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে কি না।

(৭) বাদি স্থায়িভাবে ইঞ্জাংসনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছে; তাহা সে পাইতে পারে কি না।

(৮) সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত মামলায় বাদির কোন স্বত্ব প্রতিপন্ন হয় কি না।

(৯) মেজকুমারের শবদেহের সৎকার হইয়াছিল কি না।

(১০) বাদি কোন সুবিধা পাইতে পারে কি না এবং তাহার কোন সুবিধা পাওয়ার অধিকার থাকিলে তাহা কিরূপ ধরণের।

বাদীর প্রার্থনা

ভাওয়াল সন্ন্যাসি মামলায় বাদি আদালতের নিকট নিম্নলিখিত প্রার্থনা করিয়াছেন :—

(১) বাদকে ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া ঘোষণা করা হউক।

(২) বিবাদি রাণী বিভাবতি দেবির উপর এই মর্ম্মে একটি স্থায়ি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হউক যে, ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সম্পত্তির এক তৃতিয়াংশ এবং তাহা হইতে উৎপন্ন সম্পত্তি ভোগ দখলের ব্যাপারে তিনি যেন বাদিকে কোন প্রকারে বাধা প্রদান না করেন।

(৩) সমস্ত বিবাদির উপর এই মর্ম্মে একটি অস্থায়ি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হউক যে, এই মামলার শুনানি চলিবার সময়ে তাঁহারা যেন বাদির ভোগদখলে কোন প্রকারে বিঘ্ন উৎপাদন না করেন।

(৪) যে অবস্থায় এবং যে কারণে নামলা আনয়ন করা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া আইন অনুসারে বাদির আর যদি কোন প্রকারে কোন কিছু সাহায্য প্রাপ্য হয়, তাহা প্রদান করা হউক।

(৫) মামলায় বাদি পক্ষের যে ব্যয় হইবে তাহা বিবাদি পক্ষ হইতে আদায় করিবার জন্য বাদির অনুকূলে ডিক্রি দেওয়া হউক।

ভাওয়াল মামলার জের

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন ?

কোন পক্ষই সাহায্য পাইবেন না

ভাওয়ালের সম্পত্তির এক তৃতিয়াংশ মেজকুমারকে সমজাইয়া দিতে হইবে বলিয়া বোর্ড অব রেভিনিউর কর্ত্তৃপক্ষ, কোর্ট অব ওয়ার্ডসকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন,—এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইশাছে। "আনন্দবাজার" পত্রিকার প্রতিনিধি এই সংবাদের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেন। অনুসন্ধানের ফলে তিনি জানিতে পারেন যে, ঢাকার অতিরিক্ত জেলা জজ শ্রীযুত পান্নালাল বসু মহাশয় যে রায় দিয়াছেন, তাহার পর বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের রেভিনিউ বোর্ডের কর্ত্তৃতাধীন কোর্ট অব ওয়ার্ডস এখন ভাওয়াল সম্পত্তির অছিস্বরূপে কার্য্য করিবেন,—অর্থাৎ কোর্ট অব ওয়ার্ডস। এখন আর মেজকুমার অথবা মেজরাণী—কোন পক্ষকেই অর্থ সাহার্য্য করিবেন না তাঁহারা এই বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকিবেন।

ভাওয়াল এষ্টেটের খাজনা কুমার আদায় করিতে পারিবেন না

ঢাকার কমিশনারের ইস্তাহার

ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ নেলসন এবমর্ম্মে এই ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন যে কোর্ট অব ওয়ার্ডস কুমারের প্রাপ্য এক তৃতিয়াংশ তাঁহার হস্তে অর্পণ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার অংশের খাজনা আদায় করিবার ও রসিদ দিবার অধিকার কোর্ট অব ওয়ার্ডস ব্যতীত আর কাহারও নাই কুমারের অংশ তাঁহার হস্তে অর্পণ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাপ্য টাকা কোর্ট অব ওয়ার্ডসে জমা থাকিবে ভাওয়ালের সর্ব্বত্র এই ইস্তাহার বিলি করা হইয়াছে।

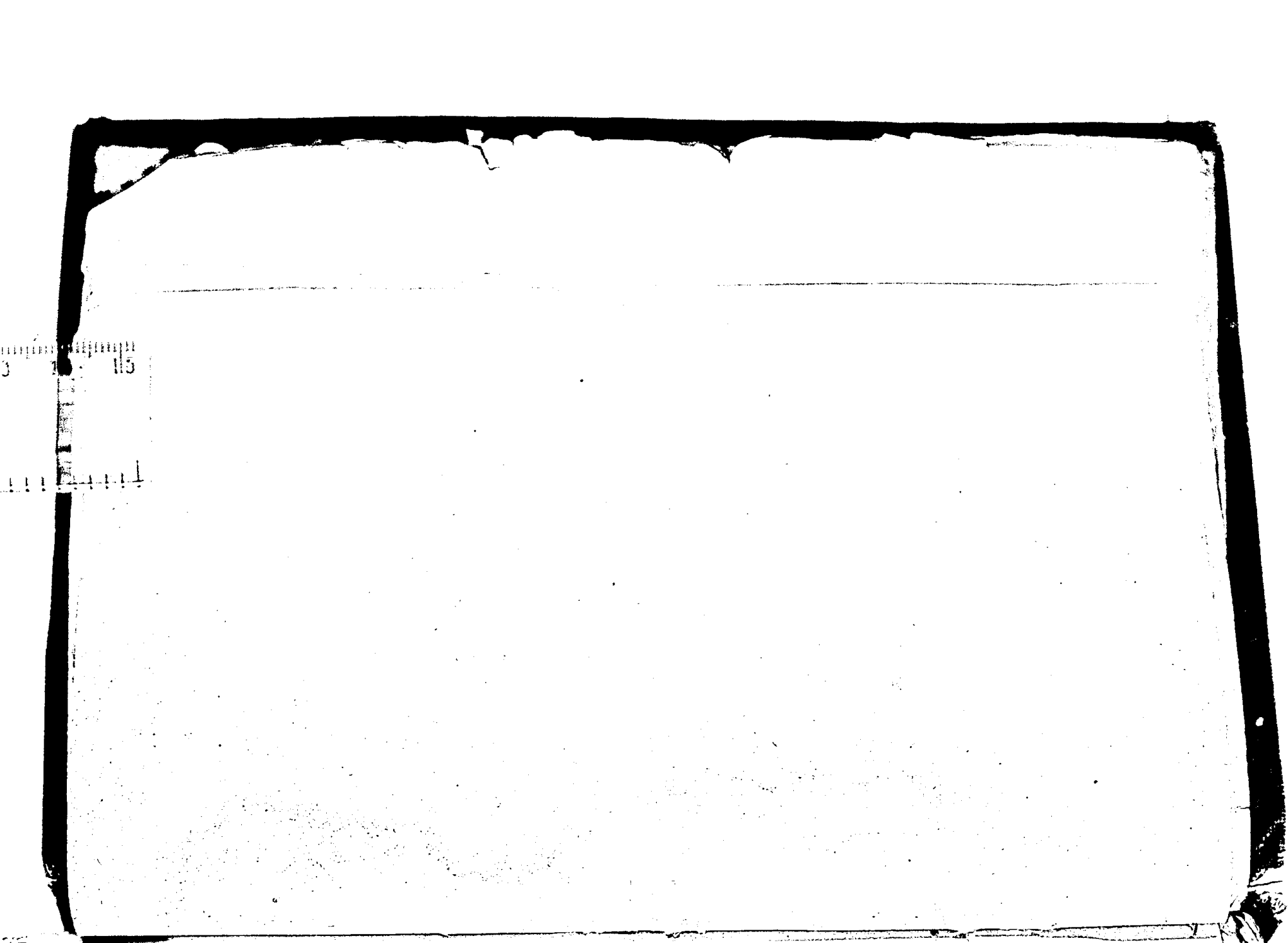

ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করা

ইণ্ডিয়ান লেবরেটরী কৃত সিংহ মার্কা

হজমী টেব্‌লেট—অজীর্ণ, অম্ল, অম্লশূল, উদরাময়, ওলাউঠা, বুকজ্বালা, অগ্নিমান্দ্য, অম্লপিত্ত পেট কামড়ান, ঢেকুর উঠা, পিত্তশূল, অম্লোদ্গার, আহারান্তে ভেদবমি, অরুচি প্রভৃতির মহৌষধ। ২টী টেবেলেট ঠাণ্ডা জল দ্বারা সেব্য। ২৫ টেবলেটের শিশি ।০ আনা, ১০০ টেবলেট শিশি ৸০ আনা।

শক্তি টেব্‌লেট—ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য, ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও রক্ত দুষ্টির মহৌষধ। প্রতি শিশি ৩০ টেবলেট ১।০ আনা।

জ্বরাজীন—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভেষক নিয়মে রাসায়নিক সংমিশ্রণে সর্ব্ববিধ জ্বরের বীজাণু ধ্বংসকারী মহৌষধ। প্রতি শিশি ॥৵০

গণোসুধা—নূতন পুরাতন গণোরিয়া, রক্ত, পূয, জ্বালা যন্ত্রণা সহ ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। প্রতি শিশি ১॥৵০ আনা।

দদ্রুনাশক মলম—অব্যর্থ দাদের মলম। ব্যবহারে যন্ত্রণা নাই, দাদে মালিস করিতে পারেন।

ক্রিমিনাশক টেবলেট—সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি ক্রিমি-জন্মিত উপদ্রব নাশক মহৌষধ।

ইণ্ডিয়ান লেবরেটরী

হেড অফিস—ষ্টেশন রোড, ঢাকা।

আর্ট প্রেস—ঢাকা।